প্রথম অধ্যায়

'দ্বিজেন্দ্রলালের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা'

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কল্পনার আদর্শ প্রবর্তন করেছিলেন, সেই আদর্শের অভিনবত্বে অনেক কবিই ছিলেন প্রভাবিত। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০ - ১৮৯১), সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৭ - ১৯৩২), সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫ - ১৯২৬), প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১ - ১৯৩৫), প্রিয়নাথ সেন (১৮৫২ - ১৯১৬) সকলেই ভাব ও প্রকাশভঙ্গিমায় রবীন্দ্রাদর্শের অনুসরণ করে চলেছিলেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ঈশ্বর বিশ্বাস, ভগবদ্‌ভক্তি ও গ্রামপ্রীতি প্রবল ছিল, রবীন্দ্রানুগামী কবিরা কাব্যক্ষেত্রে সেই ঐতিহ্যকেও রক্ষা করেছিলেন। তবে কেবল অনুসরণই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পাদে রবীন্দ্রানুগ ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রবিরোধী এক ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১ - ১৯০৭), গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫ - ১৯১৮), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০-১৯২৬), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১ - ১৯২৬) ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০ - ১৯২১) ছিলেন এ ধারার অন্যতম লেখক। এদেরই প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বাস্তববাদী, স্পষ্টতাবাদী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ - ১৯১৩)। তিনি রবীন্দ্র-যুগের কবি হয়েও বাংলা কাব্য তথা সাহিত্যজগতে মানসিকতা ও কাব্যকলাবিধির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রতিভা নিয়েই দেখা দিয়ে ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহন করেন ১৮৬৩খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই, (১২৭০, ৪ঠা শ্রাবণ), নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। তাঁর পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় সেখানকার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। আর মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর কালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র।

তাঁর ছয় দাদা ছিলেন আর ছিল মালতী নামে এক ছোট বোন। তাকে তিনি প্রাণোপম ভালবাসতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নাম যথাক্রমে - রাজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রলাল

রায়, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, সুরেন্দ্রলাল রায়, নরেন্দ্রলাল রায়, ও হরেন্দ্রলাল রায়। এঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গসাহিত্যসংসারে সুপরিচিত ছিলেন। সেকালে প্রকাশিত 'বঙ্গবাসী', 'সুরভি' 'Bengalee', 'নবপ্রভা', 'পতাকা' প্রভৃতি পত্রিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করতেন এঁরা। ইংরেজি সাহিত্যেও এঁদের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই কৃতবিদ্য অগ্রজদের সৎদৃষ্টান্ত ও সাহচর্যেই নিতান্ত বালক বয়স থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে জেগেছিল গভীর বিদ্যানুরাগ এবং সাহিত্যপ্রীতি। রাঙাবৌদি মোহিনী দেবীর সস্নেহ লালন এবং উৎসাহ বাক্যও দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করে তুলতে সহায় হয়েছিল।

এছাড়া তাঁর ব্যক্তি ও সাহিত্যিক জীবনের ওপর ছিল সুনামধন্য পিতামাতারও অপরিসীম প্রভাব। কেননা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অত্যন্ত সরলা, কোমলহৃদয়া ও লক্ষ্মী-স্বরূপিনী, তাঁরই স্নেহময়তা ও সন্তানবাৎসল্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে এক গভীর অটুট ও অচলভক্তির উদ্রেক হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে এই মাতৃভক্তিকেই আমরা পরিস্ফুট হতে দেখি। আর সুকণ্ঠ গায়ক, সুরসিক, আভিজাত্যপূর্ণ, তেজস্বী উন্নতচরিত্র পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন দ্বিজেন্দ্র-জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ। 'দুর্গাদাস'(১৯০৬) নাটকের উৎসর্গে পত্রে তিনি নিজেই লিখেছেন -

> " যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস চরিত্র অংকিত করিয়াছি, সেই চির আরাধ্য পিতৃদেব কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।" [১]

অর্থাৎ পিতার মতো ঋজু, বলিষ্ঠ, উন্নত ও তেজস্বী চরিত্রই তিনি অংকন করেছেন তাঁর দেশাত্মবোধক নাটকগুলিতে।

আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ছিল বাঙালীর আত্মসম্প্রসারণের যুগ। তাঁদের নবজাগ্রত চৈতন্য এসময় সংকীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অচলায়তন ভেঙে বিচিত্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নবজাগরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেকালে কৃষ্ণনগরের বুকেও আলোড়ন তুলেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত(১৮২০-৮৬)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ নবযুগের পুরোহিতবৃন্দ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের বন্ধু। তাঁর বাসভবনেও ছিল এই সমস্ত জ্ঞানীগুনী ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সমাগম। এই সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল আর্বিভূত ও লালিত পালিত হন। ফলে বালক বয়স থেকেই তাঁর মনে অল্প অল্প করে জেগে ওঠে দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রীতি। এরই পরিচয় পাওয়া যায় ১২ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের মধ্যে লেখা 'আর্য্যগাথা' ১ম ভাগ (১৮৮২) - এর কবিতায়।

এছাড়া মহারাজ সতীশচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ - ১৮৮৯) এই পিতৃবন্ধুদের বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মহাকবি মধুসূদন (১৮২৪ - ৭৩) দত্ত হেমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৯০৩) কবিতা সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁরা "কৌতুহলী হইয়া [redacted] দ্বিজেন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহাকে কবিতাপাঠে উৎসাহিত করিতেন।" [২] এই কাব্যপাঠ করতে করতেও বালক বয়সে তাঁর মনে জাগে কবিতা রচনার আকাংক্ষা বা সাহিত্যপ্রীতি। আবার জন্মস্থান কৃষ্ণনগরের রমণীয় উদ্যানে প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হতে হতেও বালক দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে সৌন্দর্যবোধের এবং কবিত্বের উন্মেষ ঘটে।

সর্বোপরি যে গান তিনি সারাজীবন ধরে রচনা করে গেছেন সেই সঙ্গীতানুরাগও তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল সুগায়ক ও সুকণ্ঠ পিতার প্রভাবেই। নিতান্ত বালক বয়সেই তিনি পিতার সঙ্গীতপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। কবিজীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন -

> "দ্বিজেন্দ্রের বয়স যখন চারি পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন একদিন কার্ত্তিকেয়বাবু হার্ম্মোনিয়াম বাজাইয়া 'ক্যায়সে কায়টে পেয়ালা মেয় নাগরী" খেয়ালটী গায়িতে ছিলেন। দ্বিজেন্দ্র নিকটে শুইয়া একাগ্র মনে যন্ত্রের উপর পিতার হস্তচালনা লক্ষ্য করিতেছিলেন। গানটি শেষ হইলে রায় মহাশয় একবার বাহিরে যান। তৎকালে

হার্মোনিয়ম দুর্মূল্য ছিল বলিয়া তিনি যন্ত্রটী যত্ন করিয়া রাখিতেন। কাহাকেও হাতে দিতে দিতেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন দ্বিজেন্দ্র যন্ত্রটীকে হাতে পাইয়া চাবিগুলি টিপিয়া, তিনি যে গানটী গায়িতেছিলেন তাহারই সুর বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া দ্বিজেন্দ্রকে গানটী বাজাইতে অনুমতি দিলেন। এবং দ্বিজেন্দ্র সেই সুরের অনুকরণে কোনরকমে গানটী বাজাইয়া পিতাকে প্রীত ও চমৎকৃত করিলেন।" [৭]

বস্তুতঃ সেকালে কৃষ্ণ নাগরিক সমাজে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন তার মধ্যমণি। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যে জলাঙ্গী নদীর মুখে একথাই স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন -

" কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্যপ্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান,
সুমধুর সুরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী ।"

(অষ্টম সর্গ, 'সুরধুনী')

এই সাংস্কৃতিক পরিবেশেই গড়ে উঠেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতমুখ মনোজীবন। প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) 'আত্মকথা' গ্রন্থেও এর প্রমাণ রয়েছে।

"দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভা-সমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধ হয় কণ্ঠসঙ্গীত তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন।" [৪]

শৈশবে দ্বিজেন্দ্রলাল বারবার মৃত্যুর কবলে পতিত হয়েছিলেন। একবার ছয়মাস বয়সে ধাত্রীর কোল থেকে অতি ভয়ানকভাবে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আঘাত পান, তাতে তাঁর মুখ চিরদিনের জন্যে বেঁকে যায়। শেষ বয়সে অবশ্য ততটা বোঝা যেত না। আর একবার

ঢেঁকীর ওপর থেকে পড়ে গিয়ে একটি হাত ভেঙ্গে ফেলেন। ছেলেবেলা থেকেই দুরারোগ্য ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন তিনি। তবু যখন মাতৃভাষার চর্চ্চা করতে শুরু করলেন, তখন থেকেই তাঁর ভাবময় হৃদয়ে সঙ্গীতপ্রবাহ যেন স্বতঃই দুর্বারবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তাইতো বিমুগ্ধ শিশুকবি কখনো শশধরকে সম্বোধন করে বলেছেন -

"হেসে হেসে, ভেসে ভেসে,
চলি যাও কোন্ দেশে,
চারিধারে তারাহারে রহে ঘেরে সারিসারি।"

('চন্দ্র', আর্য্যগাথা-১ম ভাগ)

কখনো বা নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে বলেন -

"নক্ষত্র কে বল সৃজিল তোমারে।
কে বল সৃজিয়া, দিল রে রাখিয়া
সুদূর অম্বরে।"

('একটি নক্ষত্র', আর্য্যগাথা - ১ম ভাগ)

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবই ছিল একটু অন্যধরণের। ইংরাজ কবি Wordsworth ও Shelley-র শৈশব জীবনে যে বিষাদম্লান, চিন্তান্বিত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যজীবনও ছিল অনেকটা সেই ধরণের। প্রথম থেকেই তিনি অত্যন্ত অল্পভাষী ও গম্ভীর ছিলেন, অন্যমনে ও পীড়িতভাবে যেন সর্বদাই আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকতেন। কারণ শৈশবকালেই তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, কিভাবে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত করে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনা যায় ? সেসঙ্গে এও ভাবতেন, ছেলেবেলার দিনগুলিই ছিল সুখের, এখন নেই আনন্দ, নেই ভালবাসা।

"আহা-আর কি ফিরিবে হায়,
সেই দিন পুনরায়,
ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে!"

('বিগত শৈশব', আর্যগাথা - ১ম ভাগ)

বিষন্নচিত্তের এই আর্ত হাহাকারই ধ্বনিত হয়েছে বালক কবির রচিত কবিতায়। মনে হয়, পরিণত বয়সে বা শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা যে উদাসী বৈরাগী মূর্তিতে দেখতে পাই। সেই উদাসীনতার বীজ যেন এসময় থেকেই তাঁর জীবনে সঙ্গোপনে উপ্ত হতে আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৫ সালে) 'কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল' থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ, ১৮৮৩ সনে হুগলী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ, পাশ করেন এবং ১৮৮৪ সনে পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম.এ পরীক্ষায় ২য় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন।

গান ও কবিতাদি রচনাতেও আমরা তাঁর অসাধারণ প্রখর মেধার পরিচয় পাই। ১৮৮২ সনে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর যে প্রথম বাংলা কাব্য 'আর্য্যগাথা (১ম ভাগ)' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাতে তৎকালীন কবিতাও সঙ্গীতের ন্যায় সর্বাপেক্ষা প্রেমের প্রাধান্য ছিলনা। এতে বাস্তববাদী কবি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপশোভা অংকনের সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেছেন দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে কিছু বন্দনাগীতি। একাব্যের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন -

> "যদি কেহ প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে কখন কখন বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতি রচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সংকুল জগতে দুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্রান্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে "আর্য্যগাথা" তাহারই আদর চাহে।"[৫]

এরপর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্যে ষ্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলাতে চলে যান, ফলে অনেকদিন বাংলা কবিতা রচনা করা তাঁর পক্ষে

সম্ভব হয়নি। তবে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে এই বিলাতপ্রবাসের তাৎপর্যকেও অস্বীকার করা যায় না। সেখানে গিয়ে প্রবাসী জীবনের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল ও রাঙাদা হরেন্দ্রবাবুর একযোগে সম্পাদিত 'পতাকা' পত্রিকায় 'বিলাতপ্রবাসী' নাম দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি তাঁর গদ্যরচনার মূল্যবান নিদর্শন। এছাড়া বিলাত প্রবাসের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - **বিনিতি**-সঙ্গীতশিক্ষা ও 'Lyrics of Ind' নামে ইংরেজি কাব্যের প্রকাশ। আবার পরবর্তীতে তিনি যে নাট্যকারের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, সেই নাটক রচনার প্রেরণাও লাভ করেছিলেন বিলাতে দেখা বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের অভিনয় থেকেই। তিনি নিজেই লিখেছেন - "বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।"[৬]

দীর্ঘ তিন বৎসর পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সিসিটার কলেজ থেকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ..... উপাধি এবং রাজকীয় কৃষি কলেজ ও কৃষক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়ে যথাক্রমে ..... ও ..... উপাধি পেয়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভোগ করতে হয় নানাধরনের সামাজিক নির্যাতন। কারণ বিলাত যাওয়া তখনকার সমাজে ছিল ঘোরতর অন্যায়। সেজন্য তাঁর আত্মীয়স্বজন মুখে সন্তোষ প্রকাশ করলেও সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ব্যবহারে তাঁরা স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান রক্ষা করেই চলতে লাগলেন। কেউ কেউ আবার তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত করতে বললেন।

এই সামাজিক নির্যাতন চূড়ান্তভাবে দেখা দেয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে)। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর সঙ্গে যখন দ্বিজেন্দ্রলালের বিয়ে হয়। যে কয়জন বরযাত্রী সেখানে যান, তারা সবাই সমাজচ্যুত হবার হুংকার পেয়ে বিয়ের আগেই চলে আসেন।

এই জাতীয় সামাজিক উৎপীড়ন ও নির্মম আচরণের জন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সংবেদনশীল তরুণমনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যা তাঁর সাহিত্যজীবনকেও করেছিল বিশেষভাবে প্রভাবিত। 'একঘরে' নামে একটি নকশা রচনা করে সেকালের সমাজ সংরক্ষকদের প্রতি অব্যর্থ লক্ষ্য বিষবাণ বর্ষণ করেন তিনি। এতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এতই তীব্র হয়েছিল যে, ভাষা ও ভাবগত সংযম পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এর ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখেছিলেন - "ইহার ভাষা আটার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায়ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদদলিত ভুজঙ্গের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা।"[১৭]

কেবল 'একঘরে'ই নয়, দ্বিজেন্দ্র-মানসে তখন প্রবাহিত হচ্ছিল একই সঙ্গে দুটি ধারা। একদিকে নব-পরিণীতা পত্নী সুরবালা দেবীকে ঘিরে তাঁর ছিল আত্মমুগ্ধ প্রেমবিহ্বল স্বপ্নাতুর কবিচিত্ত, অন্যদিকে তাঁর সামনে ছিল সামাজিক অসঙ্গতি-ক্ষুব্ধ মানুষ ও তাদের আচরণ। রোমান্টিক কাব্য 'আর্যগাথা ২য় ভাগ'(১৮৯৪) ও রোমান্টিক নাট্যকাব্য 'পাষাণী'(১৯০০) 'তারাবাই'(১৯০৩) এবং সেসময়কার সামাজিক আচার ব্যবহারকে অনুসরণ করে লেখা কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ প্রহসন ও কবিতা - 'প্রায়শ্চিত্ত'(১৯০২), 'হাসির গান'(১৯০০), ব্যঙ্গকাব্য 'আষাঢ়ে'(১৮৯৯)ও সে সময়েই রচিত হয়।

বিলেত থেকে ফেরার পর সামাজিক উৎপীড়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মজীবনেও ঘটে কিছু স্মরণীয় ঘটনা, যার প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাধীনচেতা, স্পষ্টভাষী দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেত থেকে ফিরে ছোটলাটের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছিলেন, ছোটলাট তাতে মোটেই খুশী হননি, ফলে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হতে হয়। এরপরই গবর্ণমেন্ট তাঁকে সেটলমেন্টের কাজ শেখার জন্য মধ্যপ্রদেশে পাঠান। তিন মাসের মধ্যে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ১৮৮৮ সনের ১লা জানুয়ারী শ্রীনগর ও বনেলি এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটলমেন্ট অফিসার হয়ে ধাপার পরগণায় যান। সেখান থেকে মুঙ্গের ও মুঙ্গের থেকে পূর্ণিয়ায় একই কাজ শেষ করে ১৮৯০

খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান স্টেটের সুজামুটা পরগণায় সেট্‌লমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন, তাঁর পূর্ববর্তী অফিসাররা জরীপে জমি বেশী পেলেই বেশী খাজনা ধার্য্য করতেন, অথচ জমিদাররা প্রজাদের জমি মেপে দিতেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাই বললেন, খাজনা বেশী দিতে হলে অবশ্যই দেখাতে হবে, প্রজা কতটুকু বেশী জমি অধিকার করেছে। এই রায় থেকে জজের কাছে আপীল হলে জজ রায় উল্টিয়ে প্রজাদের খাজনা বেশী বাড়িয়ে দিলেন। গভর্ণর স্যার চার্লস তখন মেদিনীপুরে এসে কাগজপত্র দেখে দ্বিজেন্দ্রলালকে ভর্ৎসনা করলে দ্বিজেন্দ্রলাল সেট্‌লমেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁর অনভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দেন। ছোটলাট রেগে গিয়ে সেট্‌লমেণ্ট অফিসারদের কর্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হাইকোর্টের দাক্ষিণ্যে দ্বিজেন্দ্রলালেরই জয় হল। এই ঘটনায় বাংলাদেশের প্রজাদের বিশেষ উপকার সাধিত হলেও চাকুরি জীবনের ওপর দ্বিজেন্দ্রলালের মনে বিরক্তি-ভাব জন্মায়।

এরপর তিনি সেট্‌লমেণ্ট বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অল্পসময়ের জন্য দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আবকারী বিভাগের প্রথম ইনসপেকটারের পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় চলে আসেন তিনি। এবং সেখান থেকেই বিভিন্ন মফস্বলে ঘুরে বেড়িয়ে পরিদর্শকের কাজ করতে থাকেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল আগাগোড়া সদালাপী ও মজলিশী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাই কলকাতায় বাসা বাধার পরই তিনি 'India Club' বা ভারতসভার মেম্বার হয়ে কিছুদিন পরে একে 'ডাকাত ক্লাব' নামে প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রতি রবিবার এই সভা প্রাতরাশ দিয়ে শুরু হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ বা নৈশ ভোজ দিয়ে শেষ হোত। এখানে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩), রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯) ও কবিবন্ধু

দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিক ও নানা শ্রেণীর লোকেরা উপস্থিত হয়ে গান, গল্প, পাঠ, আবৃত্তি ইত্যাদি নানা সাহিত্যিক আলোচনা ও তর্কবিতর্কে দিন কাটাতেন ও সেই সঙ্গে চলত বিভিন্ন ধরণের নাটকাভিনয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানও এখানে সকলে উপভোগ করতেন।

আবকারী বিভাগের পরিদর্শক থাকার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল একটি বজরা কিনেছিলেন, সেই বজরায় তিনি ও তাঁর বন্ধুরা (সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেদার মিত্র, রসময় লাহা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) রাত ৯টা, ১০টা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝেই বজরাতে পার্টি বা ভোজের আয়োজনও থাকত। সঙ্গীত ও নানাবিধ সাহিত্যালোচনায় এবং হাসি, আহ্লাদ, আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে তাঁরা সেখানে সময় অতিবাহিত করতেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গড়ে ওঠে দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর বন্ধুত্ব, এতে তাঁর সাহিত্যজীবনও অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়। কবিবন্ধু ও 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায় বলা যায় -

> "সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পরস্পরের একান্ত গুণ-মুগ্ধ ও অনুরক্ত হ'য়ে পড়ছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হ'য়ে উঠ্ছিল।" [৮]

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের যে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যটি প্রকাশিত হয়, যাতে ছিল কিছু প্রেমের কবিতা, কিছু বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবিতা এবং এক গুচ্ছ বিদেশী কবিতার অনুবাদ, এসময় রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্যগাথা'-২য় ভাগ'এ তারই সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। একাব্য প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই উদীয়মান কবিকে সাহিত্য দরবারে অভিনন্দিত করে নিয়ে যান। সে সময় রবীন্দ্রনাথের লেখনী 'সোনারতরী' পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আবার ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে চিত্রা কাব্যের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে কেরাণী জীবনের ধূলিমাখা ছবি এঁকেছিলেন, সেখান থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেই দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ১৩০১ সালে 'সাধনা' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ সংখ্যা), 'কেরাণী'

কবিতা লেখেন তখনও রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে এর প্রশংসা করেন।

কৌতুকের কারণ কি, কৌতুকে হাসির যাত্রা কতটুকু ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুকহাস্যের যাত্রা'(১৯০৭) প্রবন্ধটি প্রকাশের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভাও সেই কৌতুকহাস্যের পথ বেয়েই চলতে থাকে। ফলে তিনি 'অদলবদল', 'রাজা' নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা', 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' প্রভৃতি বহু আষাঢ়ে গল্প লেখেন। দেবতা এবং প্রচলিত লৌকিক ধর্ম নিয়েও রবীন্দ্রনাথ যে কতগুলি বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গকৌতুক লিখেছিলেন যেমন 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' (সাধনা : ১৩০১, ভাদ্র), 'স্বর্গীয় প্রহসন' (১৩০১ আশ্বিন- কার্ত্তিক), 'নূতন অবতার'(১৩০১ পৌষ) সেগুলিরই যেন ছায়া রয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' প্রহসনে।

এছাড়া ১৩০৬ সালে 'কাহিনী'তে রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্য নিয়ে সাহিত্যের যে এক নূতন রীতির পরীক্ষা করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'(১৩০৭), 'সীতা'(১৩০৯), 'তারাবাই'(১৩১০) ইত্যাদি নাটকে আমরা সেই পদ্ধতির অনুকরণ দেখতে পাই। রবীন্দ্র নাট্যকাব্যের মতো পৌরাণিক ও অর্ধ-ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে পদ্যে রচিত এসমস্ত প্রহসন।

১৩০৪ সালে 'বিরহ' নামে সামাজিক প্রহসন লিখে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেও দ্বিজেন্দ্রলাল গভীর বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার ১৩০৫ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গকাব্যটি প্রকাশিত হলে ঐ বৎসরের অগ্রহায়ণেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে এক দীর্ঘ সপ্রশংস সমালোচনা লেখেন। যখন আবকারী বিভাগের পরিদর্শকের কাজে তাঁকে 'ধনধান্যপুষ্পভরা', 'সুজলা, সুফলা শস্য-শ্যামলা' মাতৃভূমির বুকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তখন একদিকে যেমন তাঁর কবিত্বশক্তি স্বতঃই স্ফূর্তিলাভ করেছিল, অন্যদিকে কর্মজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টিকে করে তুলেছিল-তির্যক। এই 'আষাঢ়ে' কাব্যে রয়েছে চাকুরী জীবনের সেই বিড়ম্বনারই সকৌতুক বর্ণনা -

"খেটে খেটে খেটে -
আসি রোজই মুনিবের শ্রীপদযুগ চেটে,
দীনমূর্ত্তি, দেখিলেই মুনিবও যান ক্ষেপে,
রুদ্রমূর্ত্তি দেখিলেই ভৃত্য ওঠে কেঁপে,
তদীয় এক তাড়ায়
যেন বা ভূত ঝাড়ায়" ('কেরাণী' আষাঢ়ে)

এই ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাবেগরঞ্জিত রোমান্টিক উচ্ছ্বাস দ্বিজেন্দ্রলালের এসময়কার সব রচনাতেই পরিস্ফুট। কি নাটক, কি প্রহসন, কি গান, কি কবিতা - এই সমৃদ্ধি পর্বের প্রায় সব রচনাতেই রয়েছে এই দুটি বিরোধী ভাববৃত্তির পরিচয়। দাম্পত্য প্রেম ও বাৎসল্য-রসের কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে দুঃসহ কর্মজীবনের ছাপ।

"হায় শুধু অন্নচিন্তা যদি না থাকিত
ও অন্ততঃ
দিবায় ছয়টি ঘন্টা পরদাস্য না করিতে হ'ত"
(সমুদ্রের প্রতি, মন্দ্র)

এই 'মন্দ্র' কাব্যকেও রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বিশেষভাবে সমাদৃত করেন -

" এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবধি সাহস বিরাজ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দনির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুন্ন। ... কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন। ... দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্রে তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য ও করুণা মাধুর্য বিস্ময় কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।" [১]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কবি-জীবন যখন এই নানাবিধ সৃষ্টি সাফল্যের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ, সেই চরম মুহূর্তে একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করে সুরবালাদেবীর মৃত্যু হয়,

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে নেমে আসে এক তীব্রতম আঘাত। ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে হারিয়ে এবং মাতৃহারা শিশুপুত্র ও কন্যার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে তাঁর বেদনার অন্ত থাকল না। সেই বেদনাই তাঁর শিল্পী বা সাহিত্যিক জীবনে নিয়ে এল এক গভীর পরিবর্তন। যে হাসি ছিল কবি-জীবনে সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো, পত্নীবিয়োগের পর সেই হাসির গান গাওয়া ছেড়ে দিলেন তিনি। এরপর যতবারই তিনি হাসতে চেষ্টা করেছেন ততবারই হাসি যেন করুণায় ভরা, অনুকম্পা ও সহবেদনায় গড়া ঘনীভূত বেদনায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এসময় থেকে এক উদাস বিষন্নতা তাঁকে গ্রাস করে।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি তথা সাহিত্য জীবনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়: স্ত্রীবিয়োগের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমার্ধ ও স্ত্রী বিয়োগের পরবর্তীকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধ। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, প্রথম পর্যায়ে উচ্ছ্বাসিত আবেগ-পূর্ণ গীতিকবিতা এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ কবিতা ও প্রহসন - এই দুই-এর টানাপোড়েনে দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবিপত্নী সুরবালা দেবী ছিলেন এসময় দ্বিজেন্দ্র-জীবনে 'ঘুম ভাঙানিয়া'। তিনি এসেছিলেন প্রিয়ার মধুর রূপে, তাঁর গানে সুর দিতে, তাঁর ছন্দে নাচ দিতে, তাঁর বুকে সুধা দিতে, ঠিক যেমন কবি কীটস-এর জীবনে কাব্য-ফোয়ারার উৎসরূপে এসেছিলেন ফ্যানি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই আমরা কোনো ভাবাবেগপূর্ণ রচনার সাক্ষাৎ পাই না। এ পর্ব মুখ্যতঃ জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাট্যরচনার যুগ। এসময় দ্বিজেন্দ্রলাল যা কিছু লিখতে বসেছেন, তাতেই অন্তরের সেই উদ্দাম শোক-বেগ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। মাত্র দুটি কাব্য লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল এ সময় - 'আলেখ্য'(১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী'(১৯১২)। পত্নীবিয়োগের শোকোচ্ছ্বাসই এ দুটি কাব্যের প্রধান বিষয়। 'আলেখ্য'র কবিতায় কবির মর্মবেদনা ও বাৎসল্যরস এক প্রবল অশ্রুবন্যায় স্রোতোৎসারিত হয়েছে। আর 'ত্রিবেণী'র অধিকাংশ কবিতা হয়ে উঠেছে পত্নিপ্রেমের স্মৃতিবেদনায় অনুরঞ্জিত। যেমন -

"ফিরে দাও মোর হাস্যমুখ,
ফিরে দাও মোর শান্তি সুখ,
দেশান্তরে চ'লে যাই,
যেন ভালোবাসি নাই,
ফিরে কভু চাব নাও
- হৃদয় আমার ফিরিয়ে দাও।"

('ফিরিয়ে দাও', ত্রিবেণী)

স্ত্রীবিয়োগবিধুর দ্বিজেন্দ্রলাল তাই তাঁর শূন্য হৃদয়ের এই হাহাকারকে বহিরাশ্রয়ী উন্মাদনা ও উত্তেজনা দিয়ে অনেকটা পূরণ করার চেষ্টা করলেন, কাব্যরচনা ছেড়ে দিয়ে মনোনিবেশ করলেন ঐতিহাসিক নাটক ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায়।

বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ নানা দিক থেকে পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, সেই জাতীয়তাবোধ এই সময় (১৯০৩, ডিসেম্বর) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রসারিত হল, কোথাও গঠিত হল জাতীয় বিদ্যালয়, কোথাওবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও বা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন'। সেকালের সাহিত্যিকেরাও জাতীয় জীবনের সেই সত্তাকে রূপায়িত করতে লাগলেন গানে, কবিতায়, নাটকে নানাভাবে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭), 'প্রতাপ-আদিত্য'(১৩০৯), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'বাঙালার মসনদ'(১৯১০), গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৫), 'মীরকাশিম'(১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী'(১৯০৭) প্রভৃতি সেযুগের জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাসের উদাহরণ হিশেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নবযুগের মন্ত্রে দীক্ষিত কবি দ্বিজেন্দ্রলালও তাই সেসময় স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় বাঙালীচিত্তের জাগরণ ও তৎকালীন আবেগ-উৎকণ্ঠাকে অবলম্বন করে লিখলেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাটক। এবিষয়ে তাঁর প্রথম রচনা 'রাণাপ্রতাপসিংহ'(১৯০৫), এক শুভ মুহূর্তে উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্কের মতো, দেশাত্মবোধ ও স্বার্থত্যাগের অনাবিল পুণ্যাদর্শে বাঙালীর প্রাণশক্তিকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়। তিনিও শিশুকাল থেকেই বিভিন্ন সভা সমিতিতে সুরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা, প্রবন্ধ, গান ও বক্তৃতা শুনিয়ে দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য কখনো স্বদেশীসভায় বক্তৃতা দিয়ে লোক মাতিয়ে আসরে নামেননি। তবে স্বদেশী-আন্দোলনকালে যখন প্রায় প্রতিদিনই নানান বেশে, নানান ভাবে ও নানা ঢঙে কলকাতার ইতর ভদ্র সংখ্যাতীত উন্মত্ত জনসংঘ মনমাতানো স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে গাইতে শহরময় পথে পথে পরিভ্রমণ করে বেড়াত, তখন তিনি ''বন্দেমাতরম' বলে হাতে তালি দিতে দিতে তাদের সঙ্গে নাচতেন, দেশমাতৃকার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে খালি পায়ে, রুক্ষ কেশে, আলুথালুভাবে প্রমত্ত জনসাধারণের মধ্যে সুরচিত সঙ্গীতসুধার সঞ্জীবনী স্রোতোধারা প্রবাহিত করে দিতেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি এই দেশপ্রীতিরই পরিচয় বহন করে।

সেযুগের স্বাদেশিকতার একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল বিদেশীদ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী গ্রহন, দ্বিজেন্দ্রলাল একেও সমর্থন করতে পারেননি। তিনি মনে করতেন, বিদ্বেষবশতঃ বিদেশী দ্রব্য বয়কটের দ্বারা কখনো স্থায়ী কল্যাণ আসতে পারে না, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব দূর করে মানুষ যদি এক হতে পারে তবেই সেই বঙ্গভঙ্গকে রোধ করা যাবে। অবিচার আনুগত্য ও যুক্তিহীন অন্ধ অনুরাগের তিনি কোনোদিনই পোষকতা করতেন না। তাঁর দেশ-ভক্তির ভিত্তি ছিল সার্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও মঙ্গলেচ্ছায়।

এসময় দ্বিজেন্দ্রলাল আবকারী বিভাগের পরিদর্শক পদ ছেড়ে দিয়ে নিয়মিত ডেপুটি-গিরির কাজ নিয়ে কলকাতায় ৫ নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় থাকতেন। কারণ মাতৃহারা শিশু সন্তানদের একা রেখে নিজের সেই অবসন্ন নির্জীব মনটাকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাছাড়া স্ত্রীবিয়োগের দুঃসহ ব্যথাকে ভুলে থাকবার জন্য স্বদেশী আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কামনা করলেন বন্ধুবান্ধবদের ও সাহিত্যিকদের সাহচর্য। ফলে অনেক জ্ঞানীগুনী, সঙ্গীত ও সাহিত্য-রসিকদের অনবরত

111478

[redacted] LIBRARY

2 • SEP 1994

যাতায়াতে তাঁর গৃহ এক সাহিত্যতীর্থে পরিণত হল। সেখানে বিচিত্র কবিতাপাঠ, সাহিত্যালোচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের লেখার দোষ-ত্রুটিও সংশোধন করতেন।

কিন্তু বন্ধুবৎসল কবি তাতেও তৃপ্ত হননি। দেশশুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করবার জন্য তিনি প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে ২৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১১ সালে) 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে একটি সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রথম অধিবেশন বসে ১৩১১ সালের দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের সুকিয়া স্ট্রীটের বাসভবনে। এর কিছুকাল পূর্বে (১৩১১ সালেই) বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে তাঁর সমস্ত রচনা সম্পর্কে যে ঐশ্বরিক প্রেরণা দাবী করেছিলেন তাকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। স্পষ্টভাষীকবি রবীন্দ্রনাথকে জানান, তাঁর সমস্ত রচনা অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বেশ উগ্রভাবেই লিখেছিলেন - তিনি যা লিখেছেন তার জন্য কারও মতামত গ্রাহ্য করতে উৎসাহী নন। যারা এভাবে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি বা মতলব নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে আসেন তাঁদের কাছেও তিনি কোনোরকম কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত নন। এভাবে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে পূর্ণিমামিলনের সেই অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে প্রাণ খুলে আলাপ পরিচয়, গল্পগুজব, রঙ্গব্যঙ্গ সঙ্গীতালাপ ও কবিতাপাঠে যোগ দান করেন। সবশেষে সবাই মিষ্টিমুখ করে ঘরে ফেরার আগে যখন পরমোল্লাসে 'ফাগুনের সে ফাগের খেলায় মত্ত' দ্বিজেন্দ্রলাল তখন রবীন্দ্রনাথকে নীরব দেখে মুঠো মুঠো ফাগ নিয়ে তাঁকে রঞ্জিত করলেন। তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে মৃদু হেসে অনুরাগস্নিগ্ধ-স্বরে বললেন -

> " আজ দ্বিজুবাবু শুধু যে আমাদের মনোরঞ্জনই করেছেন তা নয়, তিনি আজ আমাদের সর্বাঙ্গরঞ্জন করলেন।" [১০]

দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য জীবনে এই পূর্ণিমা-মিলনের দান অসামান্য। এখানে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা আবৃত্তি, গান ও নাটকাভিনয় যেমন হোত, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরচিত হাস্য ও গম্ভীর রসাত্মক গান গেয়ে সকলকে মোহিত করতেন। এই 'পূর্ণিমা মিলন' উপলক্ষেই

রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গান -

"এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু, আছে কিছু জলযোগ
আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়,
এইখানেতে হয়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে
কর্ত্তে হবে কালহরণ।

('পূর্ণিমামিলন', হাসির গান)

এক বৎসর ধরে নিয়ম মাফিক প্রতি পূর্ণিমায় (রাস-পূর্ণিমা, মধু-পূর্ণিমা, রাখীপূর্ণিমা, ভাদ্র-পূর্ণিমা প্রভৃতি) নাট্যগুরু দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র, ডঃ কৈলাসচন্দ্র বসু, দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), সারদাচরণ মিত্র, গিরিশচন্দ্র বসু (১৮৫৩-১৯৩১) প্রমুখের গৃহে মিলিত হয়ে এই অনুষ্ঠান চালিয়ে গেছেন। ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমদিকে দ্বিজেন্দ্রলালকে কলকাতা ছেড়ে খুলনায় ফৌজদারী বিভাগের কাজ নিয়ে চলে যেতে হয়। তারপর থেকে এই পূর্ণিমা-মিলন মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হতে হতে এক সময় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। খুলনায় গিয়ে আবার দ্বিজেন্দ্রলাল দেশানুরাগের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে পড়েন। সেখানকার কিছু উৎসাহী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিয়ে নিজে নাটকাভিনয় করতে করতে নাট্যরচনার প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট করেন। মহৎচরিত্র অবলম্বনে 'দুর্গাদাস'(১৯০৬) নাটকটি তখনই রচিত হয়।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি সেখানেও বেশীদিন থাকতে পারলেন না। কয়েকমাস পরেই তাঁকে বহরমপুরে (মুর্শীদাবাদে) বদলী হতে হল এবং সেখান থেকেও অল্পকাল পরই সেই জেলার কাঁদী অঞ্চলে সব্ ডিভিজনের ভার নিয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ফলে তাঁর ভেতরকার কবিপ্রতিভা যেন আবার

জেগে ওঠার অবকাশ পেল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি লিখলেন সেজায়গার প্রাকৃতিক চিত্র অবলম্বনে আলেখ্য কাব্যের অন্তর্গত 'প্রবাসে' কবিতাটি। সেখানেও বেশীদিন তাঁর থাকা হল না, গয়াধামে যাবার জন্য সরকারের এক জরুরী পরোয়ানা এসে হাজির হল। প্রথম থেকে কর্মজীবনের ওপর তাঁর যে বিদ্বেষ ছিল এই বারবার বদলীতে তা চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়াল। তিনি চাকুরী ছেড়ে দিতে চাইলেন যদিও তা সম্ভব হয়নি। কারণ গয়ায় গিয়ে তাঁর পূর্ণমুখ বন্ধু অসাধারণ বিদ্বান, জেলাজজ মনস্বী লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সঙ্গে প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সহবাসে এবং তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্কে মনের সেই অবসন্নতা ও বিমনস্কতা দূরীভূত হয়েছিল। এছাড়া গয়ায় যাবার কয়েকদিন পর পাশ্চাত্য-সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রিয়নাথ সেন ও তাঁর পুত্র কবি মন্মথনাথ সেন, গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা, রসময় লাহাও সেখানে পৌছলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহস্থ সাহিত্যিক মজলিশটা কিছুদিনের জন্য বেশ 'সুরগরম' হয়ে উঠল। ১৯০৭ সনের জুন মাসে পয়াতে ভারত-গৌরব বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে তিনি 'আমার দেশ'-এর মতো দেশাত্মবোধক সঙ্গীতরচনা করে বঙ্গসাহিত্য ও বাঙালী জাতিকে সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হন।

আসল কথা, মহৎ বা উচ্চাদর্শ সৃষ্টির দিকেই দ্বিজেন্দ্রলালের মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা এতকাল ছিল। গয়ায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সংস্রবে এসে সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়ে একেবারেই সম্পূর্ণ আলাদা খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। পালিত মহাশয় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নজীর দেখিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন কেবল মহৎভাবপ্রচার বা নিখুঁত চরিত্রাংকনই উচ্চাঙ্গের নাট্যসাহিত্যের লক্ষণ নয়, সব বিষয়ে সূক্ষ্ম অভিনিবেশ ও মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি দেখালেই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়। সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলালও তখন থেকে সেই পথ অবলম্বন করেই লিখলেন 'নূরজাহান'(১৯০৮), 'সাজাহান'(১৯০৯, ৮ই আগষ্ট), 'চন্দ্রগুপ্ত'(১৯১১-২৪শে আগষ্ট), 'পরপারে'(১৯১২ - ২৮শে আগষ্ট), 'মেবার পতন' (১৯০৮) প্রভৃতি। এ নাটকগুলি রচনা করে পরমারাধ্য মাতৃভাষাকে এবিশ্বের অবিনশ্বর সাহিত্যসম্পদের সমকক্ষ ও তুল্য-মূল্য করে তুলতে যত্নবান হয়েছিলেন তিনি।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে শুধু নাট্যচিন্তাই পরিবর্তিত হয়নি, দ্বিজেন্দ্রজীবনে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, যা তাঁর সাহিত্যজীবনকেও বিশেষভাবে নাড়া দেয়। 'ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে গোপনে রবীন্দ্রনাথের যে মতবিরোধ বা পত্রালাপ বা বাদানুবাদ চলছিল, গয়ায় এসে নিত্যসঙ্গী ও প্রধান সহচর লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনাকালে তা প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হল।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সত্যানুগামী এবং স্পষ্টভাষী। নিজের যশপ্রতিষ্ঠা, লোকমত বা চক্ষুলজ্জাকে ভ্রূক্ষেপ না করে মানবসমাজের পক্ষে যা অন্যায়, অশোভন ও অসঙ্গত বলে মনে করতেন তার বিপক্ষেই দ্বিধাহীনভাবে দুর্ধারবিক্রমে লেখনী ধারণ করতেন তিনি। এজন্য বহুবার তাঁকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। একারণেই আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, রবীন্দ্র সাহিত্যের দুর্লভ ঐশ্বর্যরাশির পরম পক্ষপাতী ও প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল । এমনকি গয়ায় থাকা কালীনও তিনি ১৩১৭ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার 'বাণী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সপ্রশংস সমালোচনা লিখেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি এও বলেন যে -

> "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল pearage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।" [১১]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রেমবিষয়ক ও অস্পষ্ট রচনার তিনি ছিলেন নিতান্ত বিরোধী। 'সে আসে ফিরে', 'সে কেন চুরি করে চায়', 'দুজনে দেখা হলে' ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গানকে ইংরেজি কোর্টসিপের গান বলতেন তিনি; আর 'তুমি যেও না এখনই', 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' এসমস্ত গানকে অভিহিত করেছেন অভিসারিকার গান বলে। তাঁর মতে -

> "এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা করা , মালা-গাঁথা, দীপজ্বালা, এসকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ।" ১২

অথচ লোকেন্দ্রনাথ পালিত যখন এগানগুলিকে প্রীতির চোখে দেখেন এবং মূল্যবান সম্পদ বলেও প্রচার করতে কুণ্ঠিত হন না তখনই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের এসব রচনারীতির অস্পষ্টতার, দোষ দেখিয়ে লেখেন 'কাব্যে অভিব্যক্তি' (কার্ত্তিক ১৩১৩, প্রবাসী) নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ। এতে রবীন্দ্রনাথ

'সোনার তরী', কাব্যকে 'অস্পষ্ট', 'দুর্বোধ্য', অর্থশূন্য' ও সুবিরোধী বলে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিছু পূর্বে ১৩১৩ সালেরই শ্রাবণ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে 'কাব্যের প্রকাশ' নামে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, এতে স্পষ্ট লেখকদের ব্যঙ্গ এবং অস্পষ্ট লেখকদের সমর্থন করা হয়েছে, 'কাব্যের অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গ এনেও বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি দ্বিজেন্দ্রলাল। সেজন্য এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকারকদের দল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিপাদ্য বিষয়কে একদিকে যেমন অসার বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলেন তেমনি চারদিক থেকে নানাজনে 'সোনার তরী' কবিতাটির নানারকম কল্পিত এবং অসঙ্গত অর্থ ভেবে-চিন্তে আবিষ্কার করে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা রসগ্রাহিতার অভাব প্রমাণ করতে লাগলেন। কেউ কেউ আবার কাব্যসমালোচনার আছিলায় 'সোনারতরী'র শেষে একটি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক অর্থ বর্ণনা করে "দ্বিজেন্দ্রলালকে 'চামা' পর্যন্ত বলিয়া গালি দিতে সংকুচিত হইলেন না।"[১৩] দ্বিজেন্দ্রলাল এসব অসংযত নগন্য প্রতিবাদের কোনো জবাব না দিয়ে অবিচলিত চিত্তে 'সাহিত্য' পত্রিকায় কেবলমাত্র তাঁদের প্রতি একটা অব্যর্থ ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেন।

"একটি পুরাতনমাঝির গান।

(আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)

ঘাটে ডিঙ্গা লাগায়ে বন্ধু পানখায়ে যাও!
পান খায়ে যাও বন্ধু পান খায়ে যাও!

(২)

কোন পেরামের নাও তোমার, কোন পেরামের নাও?
একটা কথা কও বা না কও, পান খায়ে যাও।

(৩)

আমার গাছের পান সুপারী তোমায় দিমু ভাও।
কড়ির কথা শ্যামে হবে পান খাইয়া যাও!

ব্যাখ্যা

(১)

"ঘাটে = সংসারে, ডিঙ্গা = করুণা(তরী), লাগায়ে = দান করিয়া; বন্ধু = হরি, পানখায়ে = দেখা দিয়ে, যাও - যাও

অর্থাৎ - "হে হরি ! আমাকে করুণা করিয়া দর্শন দিয়া যাও।

* * *

অর্থাৎ, পুত্র যেমন পিতাকে ডাকে, ছাত্র যেরূপ গুরু মহাশয়কে ডাকে, ভক্ত সেরূপ ডাকিতেছেন না, প্রেমিকা যেরূপ প্রেমিককে ডাকে, ভক্ত হরিকে সেইরূপ ডাকিতেছেন।" [১৪]

বলাবাহুল্য এভাবে মাঝির গানের হাস্যকর ব্যাখ্যা দেবার পর আর কোনো রবীন্দ্রনুরাগী রবীন্দ্রকবিতার আধ্যাত্মিক অর্থ জাহির করতে সাহসী হননি।

তবে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১৪ সালের মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার প্রশংসা করে তাঁর জীবনদেবতাবাদের সমালোচনা প্রকাশ করার জন্য যে 'কাব্যের উপভোগ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই বঙ্গদর্শনের সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে তাঁর কাছে পাঠালে তিনি স্বয়ং ১৩১৪ সালের মাঘ সংখ্যার বঙ্গদর্শনেই দুঃখ ও বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলেন -

> "আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করি, সকল ক্ষেত্রে তাহা যে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহা আমার কাব্যসমালোচনা উপলক্ষে পূর্বেই বলিয়াছেন। আমার সেই বুদ্ধি ও বাণীর জড়িমা আমার পদ্য-প্রবন্ধেও নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে নহিলে দ্বিজেন্দ্রবাবু আমার আত্মজীবনী পড়িয়া এমন ভুল বুঝিলেন কেন ? কারণ আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না।" [১৫]

১৩১৪ সালের ৮ই ফাল্গুন শিলাইদহ থেকে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও লিখেছিলেন -

> " দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও তাঁকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপরে এইখানেইখেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে যায় - অন্তত আমি তো এই বলেই চুকিয়ে দিলুম।" [১৬]

রবীন্দ্রনাথ এরপর সত্যিসত্যিই এই বিতর্ক বিষয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে (দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর) কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়কে দেওয়া তাঁর একটি চিঠিতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। -

"তোমার পিতার বিরুদ্ধে কারো সঙ্গে আলোচনা করিনি। তার কারণ যার কাছ থেকে আমি কোনো ক্ষোভ পাই তার সম্মুখে আমি সর্বপ্রযত্নে আত্মসংবরণ করে থাকি। তোমাদের মত যাদের আমি ভালোবাসি, তাদের কখনো কখনো নিন্দা করা আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু যাদের সম্মুখে আমার কোনো প্রতিকূলতা আছে তাদের নিন্দায় আমি পারতপক্ষে যোগ দিইনে (জানুয়ারী, ১৯২৭)।" [১৭]

তবে স্পষ্ট-অস্পষ্টতার দাবী নিয়ে সাহিত্যিক বিতর্কের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

এরপর ১৩১৫ সালের মাঘ মাসে দ্বিজেন্দ্রলাল গয়া থেকে দীর্ঘ দেড় বৎসরের ফার্লো বা অনুগ্রহ বিদায় পেয়ে কলকাতায় আসেন এবং হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হন। ২ নং নন্দকুমার চৌধুরী লেনে পত্নীর সঙ্কেত অর্থে 'সুরধাম' নামে একটি অট্টালিকাও তৈরী করেন তিনি। ১৩১৬ সালের ১লা বৈশাখ নিছক হিন্দুমতে সেই নূতন গৃহে প্রবেশ করেন। তখনও গয়ায় সেই রবীন্দ্রভক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে তর্কের প্রভাব তাঁর মন থেকে দূরীভূত হয়নি। রবীন্দ্রসাহিত্যের দুর্নীতিকে দেখাবার জন্য তিনি ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'সংহিতা' পত্রিকায় 'কাব্যেনীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করলেন। এতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীতগুলির সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করেছেন 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্যটিকেও।

"রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না।" [১৮]

রবীন্দ্রনাথ এর কোনো উত্তর দিলেন না ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রভক্ত ও বন্ধু পরম পন্ডিত প্রিয়নাথ সেন দ্বিজেন্দ্রলালের উক্ত ধারণার গোড়ায় গলদ প্রমাণ করবার জন্য ১৩১৬ সালের কার্তিক সংখ্যার "সাহিত্য" পত্রিকায় 'চিত্রাঙ্গদা' নামে একটি প্রবন্ধে একথাই বিশেষভাবে বললেন যে,

"অর্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলনের পূর্বে -"কাব্যপাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় এবং বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল।" [১৯]

দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য বারবার কাব্যপাঠ করেও এর কারণ খুঁজে না পেয়ে এবং পণ্ডিত লোকের এরকম কথার প্রতিবাদ করা ধৃষ্টতা মনে করে আর লেখনী ধারণ করলেন না। একজন প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিক প্রিয়বাবুর এ প্রবন্ধের একটি প্রতিকূল সমালোচনা লিখে নিজের নাম গোপন করে 'হিতবাদী'তে প্রকাশ করেন। প্রিয়বাবু আর কোনো উত্তর দিলেন না ঠিকই, কিন্তু এই 'কাব্যেনীতি', 'কাব্যে উপভোগ' প্রবন্ধ উপলক্ষ করে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সব প্রবন্ধ, কবিতা ছড়া নানাভাবে গজিয়ে উঠেছিল তার পরিণাম দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে হয়ে উঠল অত্যন্ত শোচনীয়। নিজের বিশ্বাসানুসারে একটি স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি যেভাবে আক্রান্ত হলেন তাতে প্রথমে যা ছিল নিরপেক্ষ সাহিত্যিক অভিব্যক্তি মাত্র, পরে তা জেদে বা রবীন্দ্রবিদ্বেষে পরিণত হল। যিনি কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের গুণের প্রতি বিমুখ ছিলেন না, বারবার আক্রান্ত হয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর হলেন বিরক্ত, বিদ্বিষ্ট ও উত্তেজিত।

দ্বিজেন্দ্র-বন্ধু সেবকুমার রায়চৌধুরীকে দেওয়া রবীন্দ্রানুরাগী ও আন্তরঙ্গ বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের একটি চিঠিতে -

"সোনার তরী' নিয়ে দ্বিজুর সঙ্গে আমারই প্রথম ঘোর Discussion ('বাদানুবাদ বা আলোচনা') হয়। আপনিও জানেন - তারি ফলে তিনি ঐ প্রবন্ধটা লিখেছিলেন। কিন্তু কি কুক্ষনেই তিনি এটা লিখ্‌লেন! - তাঁর উদ্দেশ্য না বুঝে, কয়েকজন Irresponsible ('দায়িত্বহীন') লোক তাঁকে এর জন্য নাস্তানাবুদ কর্ত্তে লাগ্‌লেন। দ্বিজু রবিবাবুর Real admirer , ('প্রকৃতভক্ত বা গুণগ্রাহী') ছিলেন, -তাঁকে রবি-বিদ্বেষী বলা খুব ভারী বে-আদপী ও অন্যায়। 'কাব্যেনীতি' প্রবন্ধটা সম্বন্ধেও The same blunders repeated over again. ('সেই একই প্রমাদের পুনরাভিনয় হল'।) He never actually meant anything bad when he wrote it.(ওটা যখন লেখেন তখন বাস্তবিক তাঁর কোন বদ্ মতলব ছিল না।') তবে অত Strongly ('কঠোরভাবে') চিত্রাঙ্গদা ও রবিবাবুর কথা না বলাই উচিত ছিল, - ঐখানেই তাঁর দোষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিজু যখন যাই ধরতেন, Half-heartedly ('দু'নো-মনা' ভাবে বা আধা-আধি রকমে') কর্ত্তে পার্ত্তেন না। তাঁর nature- ই(প্রকৃতিই) সে বিষয়ে

বাধা ছিল। ব্যাপারটা যে শেষে এমন শোচনীয় দাঁড়াবে, তখন জান্‌লে, I would never have allowed him to rush into print at all.

(কখনও অমন'সাত তাড়াতাড়ি, তাঁকে ও-সব ঘোটে ছাপতেই দিত্‌ম না।')"[২০]

সে যাইহোক এই রবীন্দ্রবিদ্বেষে দ্বিজেন্দ্রলাল শেষ পর্যন্ত এমন একটি ঘটনা ঘটালেন, যার জন্য ব্যক্তি-গত ভাবে তিনি নিজে তো দু:খিত হয়েছিলেনই, উপরন্তু সাহিত্যজীবনও হয়েছিল পরিবর্ত্তিত। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪শে মে (১৩১৯, ১১ই জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গেলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২)র 'নন্দবিদায়'-(২২ আগষ্ট, ১৮৮৮)এর প্যারডি নাটিকা 'আনন্দবিদায়'(১৬ নভেম্বর, ১৯১২) লিখে স্টার থিয়েটারে অভিনীত করালেন। এর ফল খুব ভাল হল না। রঙ্গালয়ের দর্শক তথা ভদ্র শিক্ষিত বাঙালীরা হয়ে ওঠেন প্রতিবাদ-মুখর। দ্বিজেন্দ্রলালকেও রঙ্গালয় ত্যাগ করে আসতে হয়। দ্বিজেন্দ্রভক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবকুমার রায় চৌধুরীও তাঁকে বলেন - " এতদিন পরে, এই আজ আপনি আত্মহত্যা করিলেন।" [২১]

দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্যারডির ভূমিকায় লিখেছিলেন -

" ন্যাকামি, জ্যাঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। যদি কাহারও অর্ত্তদাহ হয় তো তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। ... যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাহার কর্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworth - কে এইরূপ চাবকাইয়াছিলেন।" Wordsworth মহাকবিও Shelly ও Byron কে এইরূপ কশাঘাত করিয়াছিলেন।" [২২]

বিশেষত: রবীন্দ্রনাথের যে 'গীতাঞ্জলি'(১৯১০) তখন বিলেতে সমাদৃত হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের সেই যশ, সেই গৌরবকেও এই'আনন্দবিদায়' নাটিকায় ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। যেমন -

" ২ ভক্ত- এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P.D. হয়ে আসবেন।

৩ ভক্ত- P.D. কি ?

২ ভক্ত- Doctor of Poetry.

৩ ভক্ত - ইংরেজরা কি বাঙ্গলা কবিতা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝবে ?

৪ ভক্ত - এ কবিতা বোঝার ত দরকার নাই । এ শুধু গন্ধ । গন্ধটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিলেই হল।"

('আনন্দ বিদায়' ২ / ৩)

কিংবা -

"১ শ্রোত্রী । এটা রবীন্দ্রবাবুর একটা গানের অবিকল অনুকরণ।

২ শ্রোতা । রবীন্দ্রবাবুর গান কি সব শ্রীমদ্ভাগবত ?" ইত্যাদি

('আনন্দ বিদায়' ১ / ৩)

কিন্তু রঙ্গালয়ে স্বয়ং এর অভিনয় দেখতে দেখতে এমন দুঃখিত হয়েছিলেন যে, এরপর যা কিছু রচনা করেছিলেন তাতেই Tragic- সুর বা বিষাদাচ্ছন্নতাই প্রধান হয়ে উঠতে দেখা যায়। 'সোরাব রুস্তম'(১৯০৮) নাটক প্রসঙ্গে তিনি নিজেই সেসময়কার লেখা সম্মুখে বন্ধু দেবকুমারকে চিঠিতে লিখেছিলেন -

"সত্যি সত্যিই ভীষণ ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার কি হল বল দেখি? হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলি।"[২৩]

আবার কয়েকটি বিষাদময়ক দশপদী সুরবৃত্ত সনেটও লিখেছিলেন তিনি এসময়। 'ত্রিবেনা' (১৯১২)র 'অবসান' কবিতাটিই এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। এতে কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন -

"করেছি কর্ত্তব্য যাহা, সেইটুকুই
আমার যাহা জমা,
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকুই
খরচ-দিও বাদ ।" ('অবসান', ত্রিবেণী)

অবশ্য ইতিপূর্বে (১৯০০) খ্রীষ্টাব্দে) মেট্রোপলিটান কলেজের কয়েকজন ছাত্র মুকিয়া স্ট্রীটের যে 'ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য আলাদাভাবে 'কলিকাতা ইউনিয়ন ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তার সভাপতি হয়ে সেই ক্লাবে বসে 'চন্দ্রগুপ্ত'(১৯১১) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) নামে দুটি নাটকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'আনন্দবিদায়' রচনা ও অভিনয়ের পরে তিনি আর সেরকম কিছু রচনা করতে পারলেন না। বরং প্রথমদিকে তিনি যে নাস্তিক ছিলেন, এসময় রামপ্রসাদের সাধনা ও সিদ্ধসঙ্গীত শ্রবণ করে, রামকৃষ্ণের 'কথামৃত' পাঠ করে তাঁর মধ্যে ভক্তি জাগ্রত হয়েছিল এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাবান হয়ে তিনি রচনা করেছিলেন কিছু কীর্তনগীতি।

"ওকে গান গেয়ে চলে যায় -
পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ওকে নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি'বলে
(পড়ে) ঢলে ঢলে পাগলের প্রায়।"
(বঙ্গনারী, ১-২)

কিংবা
" শুধু দুদিনেরই খেলা
ঘুম না ভাঙিতে, আঁখি না মেলিতে
দেখিতে দেখিতে ফুরায় খেলা।"
('পরপারে', ৪-২)

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁকুড়ায় বদলী হয়ে মাস তিনেক থাকার পর আবার বদলী হয়ে মুঙ্গেরে যাবার আগে ২-৪ দিনের জন্যে কলকাতায় ফিরে আসেন। সেখানেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর দিন যে ফুরিয়ে এসেছে তা বুঝতে পেরে সেসময়ই রচনা করেন 'পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে' কবিতাটি।

"পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা,
শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব,
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে," ('পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে', গান)

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' নামে একটি পত্রিকা বের করার জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল সে সময়। এরজন্যে 'সূচনা' অংশ এবং দুটি অনুপম সঙ্গীত 'ছত্রমহিমা' ও 'হরিনামের ধ্রুপদ শিখা' লিখেছিলেন। ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিলেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পত্রিকাটি প্রকাশের আগেই (১৯১৩- ১৭ মে) ১৩২০ সালের তরা জ্যৈষ্ঠ তিনি সন্ন্যাস রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেন এবং এর সাড়ে চার ঘন্টা পর (রাত নটার সময়) ঘটে দ্বিজেন্দ্রলালের আকস্মিক জীবনাবসান। তখনও তিনি সাহিত্যসাধনায় নিরত ছিলেন, 'সিংহলবিজয়'(১৯১৫) নাটকের সংশোধন চলছিল তখন। তাঁর অনেক রচনাও ছিল সে সময় অপ্রকাশিত। 'ভীষ্ম'(১৯১৪) 'সিংহলবিজয়', 'বঙ্গনারী' প্রভৃতি নাটক এবং 'চিন্তা ও কল্পনা', 'কালিদাস ও ভবভূতি (১৯১৫) প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র ৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যেই তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, প্রহসন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাস্তবজীবনের যে পরিচয় দিয়েছিলেন তার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধিত হয়েছিল। নানা সাহিত্যিক-তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের হাসির গান, ব্যঙ্গমূলক রচনা, বিভিন্ন ভাবের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রসঙ্গে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিকরা সাহিত্যে চলতি ভাষা প্রচলনের যে ঢেউ তুলেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের এই ৫০ বৎসরের জীবনের রচনাতেই তার প্রস্তাবনা ঘটে। দৈনন্দিন জীবনের চিত্র অংকনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন সহজ সরল মৌখিক ভাষা। তাঁর নিজের কথাতেই এর প্রমাণ মেলে - "যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহার কর্ত্তে পারি (শ্রুতিকটুতা, মর্য্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি।" [২৪] সব চাইতে বড় কথা, Syllabic (দলমাত্রিক) রূপ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনি যে বিশেষ নূতনত্ব এনেছিলেন তার প্রভাবও ছড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তীকালের সাহিত্যে। কাজেই তিনি যদি আর কিছুকাল মাত্র বেঁচে থেকেন তাহলে বাংলাসাহিত্যে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারত।

প্রথম অধ্যায়

<u>উল্লেখপঞ্জি</u>

১. 'ভূমিকা': দুর্গাদাস : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার : রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিতীয় সংস্করণ - ভাদ্র, ১৩৭৮ : পৃ-২ তে উদ্ধৃত।

২. 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : নবকৃষ্ণ ঘোষ : দ্বিতীয় সংস্করণ : পৃ.১০

৩. তদেব, পৃ.৯-১০

৪. 'আত্মকথা' : প্রমথ চৌধুরী : প্রথম সংস্করণ - জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ : পৃ.৩০

৫. 'ভূমিকা': আর্য্যগাথা - ১ম ভাগ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৬. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' : নাট্যমন্দির : শ্রাবণ, ১৩১৭ : পৃ.৪১

৭. 'ভূমিকা': একঘরে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার : রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিতীয় সংস্করণ - ভাদ্র, ১৩৭৮ : পৃ.১০তে উদ্ধৃত।

৮. 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিতীয় সংস্করণ - আশ্বিন, ১৩৭১ পৃ.২২২।

৯. 'মন্দ্র' : আধুনিক সাহিত্য : রবীন্দ্ররচনাবলী ([illegible] খণ্ড): জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ - ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮ : পৃ.৯৫৭

১০. 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিতীয় সংস্করণ - আশ্বিন, ১৩৭১ : পৃ.৩৪৩।

১১. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 'সূচনা' : ভারতবর্ষ : আষাঢ়, ১৩২০ : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

১২. 'কাব্যে নীতি' : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) : তৃতীয় প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৯২ : পৃ.৭০১।

১৩. 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৭১, পৃ.৪১৯।

১৪. তদেব : পৃ. ৪১৯ - ২০।

১৫. 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য' : বঙ্গদর্শন : মাঘ, ১৩১৪ : রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড) : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : চতুর্থ সংস্করণ - চৈত্র, ১৩৮৩ : পৃ.৩৭৭-তে উদ্ধৃত।

১৬. তদেব

১৭. 'তীর্থংকর' : দিলীপ কুমার রায় : পৃ.২৭০।

১৮. 'কাব্যে নীতি' : দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) : তৃতীয় প্রকাশ - আষাঢ়, ১৩১২ পৃ. ৭০২।

১৯. 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : দেবকুমার রায় চৌধুরী : দ্বিতীয় সংস্করণ - আশ্বিন, ১৩৭১ পৃ. ৪২৯।

২০. তদেব : পৃ.৪৪২

২১. তদেব : পৃ.৪৪৫

২২. 'ভূমিকা' : 'আনন্দবিদায়' : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : 'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার' : রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিতীয় সংস্করণ - ভাদ্র, ১৩৭৮ : পৃ.২০৭-তে উদ্ধৃত।

২৩. 'স্মৃতিচারণ' (১ম খণ্ড) : দিলীপ কুমার রায় : প্রথম সংস্করণ - ৭ই আশ্বিন, ১৮৮২ : পৃ.২৭১।

২৪. 'ভূমিকা' : 'আলেখ্য' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।